

মুসলিম চরিত্র

একজন মুসলিমের পূর্ণাঙ্গ চারিত্রিক রূপরেখা



মুহাম্মাদ আল গাজালি

আলী আহমাদ মাবরুর

অনূদিত

মুসলিম চরিত্র

শায়খ মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি
অনুবাদ: আলী আহমাদ মাবরুর



গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশ ন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের ভিত্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধ
 নবুওয়াতের উদ্দেশ্য : নৈতিকতার আদর্শমান
 সালাত মানুষকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে
 জাকাত হলো বিশুদ্ধতার চাবিকাঠি
 তাকওয়া অর্জনের জন্যই রোজা
 হজ্জ দুনিয়ার প্রতি মিছে ভালোবাসাকে হ্রাস করে

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিকতার ঘাটতি দুর্বল ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ
 কে দরিদ্র

তৃতীয় অধ্যায়

একজন অনুকরণীয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব কেমন হতে পারে

চতুর্থ অধ্যায়

জান্নাতের পথে নাকি জাহান্নামের পথে
 প্রথম উদ্দেশ্য- আত্মসংস্কার
 প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম
 অনাচারের বিরুদ্ধে ইসলাম
 নৈতিকতাই টিকে থাকে

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিক অপরাধের জন্যেও শাস্তি
 জোর করে চরিত্র উন্নত করা যায় না
 সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে শাস্তি নির্ধারণ
 ইসলামের আবেদন একেবারে হৃদয়ের কাছে
 সমাজের দায়িত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানবতার মুক্তির জন্য নৈতিকতার কোনো বিকল্প নেই
অমুসলিমদের সাথে আমাদের ব্যবহার
জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা

সপ্তম অধ্যায়

সত্য ও সত্যবাদিতা

পরামর্শ সবসময় সত্য ও সঠিক হওয়া উচিত
মিথ্যা হলো সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ
আপনার সন্তানকে সততার সাথে চলতে অভ্যস্ত করুন
ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলা যাবেনা
প্রশংসা করার সময় অতিরঞ্জন না করা
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যা ও ছলচাতুরী না করা
কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবেনা
সত্য কথা বলাই যথেষ্ট নয়, সত্যবাদিতার সাথে কাজও করতে হবে

অষ্টম অধ্যায়

আস্থা, আমানতদারিতা ও সততা

আমানতদারিতার ব্যপকতর সংজ্ঞা
দায়িত্ব সঠিক ব্যক্তির উপর অর্পন করার নাম আমানতদারিতা
দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাটাও আমানতদারিতা
ক্ষমতার অপব্যবহার করা আমানতদারিতার স্পষ্ট লংঘন
আল্লাহ যে সম্পত্তি ও যোগ্যতা দেন, সেটার হক আদায় করাও আমানতদারিতা
অন্যদের গোপনীয়তা রক্ষা করাও আমানতদারিতা

নবম অধ্যায়

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য
সবচেয়ে বড়ো চুক্তি
আনসারদের ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি

অতীত ভুলে যাওয়াও প্রতিশ্রুতি ভংগ করার সমতুল্য
 প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার মানবতার অপরিহার্য দাবী
 ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য
 ঋণ পরিশোধ করা খুবই কঠিন

দশম অধ্যায়

একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা

মানুষের আচরন ও কার্যক্রম নির্ভর করে তার নিয়তের উপর
 নিয়তের বিশুদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
 একাগ্রতা খুবই কাংখিত একটি বৈশিষ্ট্য
 একজন গৈর্যকে তার কাজের মধ্য দিয়েই একাগ্রতার প্রমাণ দিতে হবে
 চাকুরীজীবীরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করবে
 ছাত্র ও শিক্ষকরাও সব কিছুর আগে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিবে

একাদশ অধ্যায়

কথাবার্তার আদব

কথোপকথানের কাংখিত পদ্ধতি
 আগে নিজের বিচার করণ
 নীরব থাকলেই বেশি নিরাপদ
 আজোবাজে বিষয় পরিত্যাগ করা সফলতার পূর্বশর্ত
 দূরদর্শী হওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো হৃদয়গ্রাহী ভাষণ
 যারা অশিক্ষিত নিরবতাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত জবাব
 বিতর্ক পরিহার করণ

দ্বাদশ অধ্যায়

অন্তরকে হিংসা ও শত্রুতা মুক্ত রাখুন

মহত্বের অন্যতম স্বীকৃতি
 পারস্পরিক শত্রুতা থেকে দূরে থাকতে হবে
 সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবেনা
 হিংসা আর প্রতিহিংসা হলো শয়তানির দুই মূল সুত্রধর

গীবত থেকে দূরে থাকুন
হিংসাপূর্ণ বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকুন
হিংসার ধারে কাছেও যাওয়া যাবেনা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শক্তি

ঈমান: একটি বৈপ্লবিক ও উদ্দীপক শক্তি
দৃঢ়তা ও আস্তাই হলো শক্তির প্রকৃত বহিঃপ্রকাশ
ইসলাম পরগাছা ও তোষামোদকারীদেরকে পছন্দ করেনা

চতুর্দশ অধ্যায়

ধৈর্য্য ও ক্ষমা

ধৈর্য্য ও ক্ষমার অনন্য বৈশিষ্ট্য
ক্ষমা ও ক্ষমাশীলতা
কাউকে পরিহাস করা নোংরামির পরিচয়
অভিশাপ দেওয়া ও গালি দেওয়া হারাম
কঠোরতার উত্তর দিতে হবে নম্রতা দিয়ে
উত্তম উদাহরন

পঞ্চদশ অধ্যায়

মানবপ্রীতি ও দয়া

উদারতা: মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের অপরিহার্য অংগ
দারিদ্রতা মানবিক গুণাবলীকে ক্রমশ নষ্ট করে দেয়
দান হলো দুনিয়ায় সফলতা ও আখেরাতে মুক্তির নিশ্চিত উপায়
মানবকল্যান কার্যক্রমে সম্পদ আরও বেড়ে যায়
আপনার সম্পদের প্রথম অংশীদার কে

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

ধৈর্য্য

ধৈর্য্য হলো আলোর বাতিঘর
ধৈর্য্যের দুই স্তম্ভ

লেখক পরিচিতি

শায়খ মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি আহমাদ আল সাকা (১৯১৭-১৯৯৬) ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত ইসলামি চিন্তাবীদ। তিনি ১৯১৭ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার নিকলা আল ইনাব নামক ছোট্ট একটি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলজেরিয়ার আব্দ আল কাদির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি দীর্ঘদিন ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট (আইআইআইটি) এর কায়রো শাখার একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৬ সালে ৭৮ বছর বয়সে কায়রোতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর তৎকালীন সৌদি যুবরাজ আব্দুল্লাহ বিশেষ একটি বিমানে করে তার লাশ নিয়ে যান এবং সেখানেই পবিত্র মদিনায় তাকে দাফন করা হয়।

শৈশব থেকেই ইসলাম বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের লক্ষণ ফুটে ওঠায় তার বাবা বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক গাজ্জালির নামানুসারেই তার নামকরণ করেন। মোহাম্মাদ বিন গাজ্জালি যখন বড়ো হচ্ছিলেন তখন গোটা মিশর ঔপনিবেসিকতার পদতলে পিষ্ট হয়ে খুব বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়েছিল। তার বাবা স্বপ্ন দেখছিলেন— এই সন্তান বড়ো হয়ে ইসলামের জন্য এমন কিছু ভূমিকা রাখবে এবং ইসলামকে যৌক্তিকভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে, যার মাধ্যমে নতুন করে ইসলামের পুনর্জাগরনের একটি পথ তৈরি হয়। বাবার সেই স্বপ্ন পূরন করেছিলেন তিনি। মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি তার জীবদ্দশায় এমন কিছু বই লিখে গিয়েছেন, যা ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ করে দেয়। রাষ্ট্রযন্ত্র যেভাবে ইসলামের চিরন্তন শিক্ষা জনজীবন থেকে মুছে দিয়েছিল, সেটাকেও তিনি অনেকটাই ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

ছাত্র হিসেবে মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি তার শৈশবেই কুরআনের হাফেজ হন। এরপর তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উপর ব্যাপক পড়াশুনা করেন। ফলে সমসাময়িকদের মধ্যে আরবি ভাষায় তার মতো দক্ষ আর কাউকে পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে আল আজহারে উসুল-উদ-দীনে পড়ার সময়ও তিনি তার মেধার সাক্ষর রাখেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় যখন তিনি অধ্যয়ন করছিলেন, তখনই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্নার সান্নিধ্যে আসেন। মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি যতদিন জীবিত ছিলেন, তাকে যখনই প্রশ্ন করা হতো যে আপনার জীবন ও কর্মে কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি? তিনি অবলীলায় হাসান আল বান্নার নামই বারবার উচ্চারণ করতেন।

হাসান আল বান্নার ভাষণ ও দর্শনকে তিনি সকলের কাছে পরিচিত করতে ভূমিকা পালন করেন। মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি মূলত হাসান আল বান্নার সাথে দেখা করার পরই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্য হিসেবে যোগ দেন। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাকালীন কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় চিন্তক ছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় ও জার্নালে লেখালেখি করতেন এবং তাকেই ইখওয়ানের মূল লেখকদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচীকে তার লেখনির মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতেন।

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের যুদ্ধে অংশ নেওয়ার অপরাধে মিশর সরকার মোহাম্মাদ আল গাজ্জালিকে গ্রেফতার করে। কারাগারে গিয়েও তিনি কারাবন্দী মানুষের মধ্যে ইসলামের বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন। তিনি জেলখানার ভেতরেই স্টাডি সার্কেল করতেন, জামায়াতে সালাত পড়াতেন। কারাবন্দী সকলের জীবনটাকে ভালো কিছু কাজ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। কারাগারেও তিনি সত্য প্রকাশে ছিলেন আপোষহীন। তিনি দেখছিলেন বন্দীদের জন্য বরাদ্দ করা খাবারগুলো কীভাবে কারা প্রশাসন চুরি করে নিচ্ছে। তাছাড়া আইনশৃংখলা বাহিনীও স্বেচ্ছাচারিতার সাথেই সব কাজ করার চেষ্টা করছে। তাই জুমার সালাতের খুতবায় তিনি প্রশাসনের এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত বক্তব্য দেন। কারা প্রশাসন তাকে থামানোর নানা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সেই সব অনাচার বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

লেখক হিসেবে তিনি মোট ৯৪টি বই লিখেছেন। তার রচনাবলী মিসরের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত করেছে। তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহকে তরুণদের সামনে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেন। তাকে মিসরের ইসলামের উত্থানের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের ভিত্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধ

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য : নৈতিকতার আদর্শমান

মানবতার মুক্তিদূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে অন্ধকারের পথ থেকে সরিয়ে আবারও আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য, মানুষের মনগড়া সব তত্ত্ব আর কাল্পনিক দর্শনের উপরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র আল কুরআনের সূরা আহযাবের ৪৫ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

‘হে নবি! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।’

এ কথা শুধু মুসলমান নয়, সারা পৃথিবীর সকল ধর্ম ও গোত্রের মানুষ স্বীকার করে— শুধু আল্লাহর নবি হিসেবে নয়, নবিরাজির গোটা জীবনটাই হচ্ছে মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ। কেউ যদি নিজেকে স্বস্তি দিতে চায়, জীবনে সুখ ও সফলতা অর্জন করতে চায়, তাহলে তার জন্য রাসূল (সা.)-এর আদর্শ ও ব্যক্তিজীবন অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই।

সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

‘যারা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।’

অন্যদিকে প্রিয়নবি (সা.) এই পৃথিবীতে তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন,

‘আমাকে পাঠানো হয়েছে কেবলমাত্র নৈতিকতা এবং সদাচরণকে প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত করার জন্যই। (আল মুয়াত্তা)

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে চেতনার কথা বলেছেন, সে চেতনা মানবতার ইতিহাসে একটি অনুপম ও অলঙ্ঘনীয় বার্তা হিসেবে সবসময়ই বিবেচিত হয়ে এসেছে। একই সাথে আল্লাহর রাসূলের (সা.) দেখানো পথের অনুসরণকারীরাও চিরদিনই এই চেতনাকে সামনে রেখেই জীবন চলার পথে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছে।

উপরোক্ত হাদিসের দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (সা.) এই পৃথিবীতে আসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের নৈতিক চরিত্রকে মজবুত করা। সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষ সহজেই যেন অনুধাবন করতে পারে। নিজেদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যেন তারা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন ও ধারণ করতে পারে।

ইসলামে বেশ কিছু ইবাদাতকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বেশ কিছু মৌলিক ইবাদাতকে ইসলামের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামের এ মৌলিক ইবাদাতগুলো শুধুমাত্র এমন নয় যে, তা কোনো অজানা-অচেনা শক্তির সাথে মানুষের সম্পর্ক তৈরি করবে। আমাদের দ্বীনের কোনো ইবাদাত অহেতুক বা নিছক কোনো ধর্মীয় আচারাতি নয়; বরং সকল বাধ্যতামূলক ইবাদাত বান্দাকে সত্যিকারের নৈতিকতা অর্জনে সহায়তা করে এবং ন্যায়পরায়নতার সাথে বেঁচে থাকতে প্রশিক্ষণ দেয়। ইসলামের স্পষ্ট বার্তা— মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের এমন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত, যেন তার নৈতিকতা উত্তরোত্তর সুন্দর ও পরিশীলিত হয়। জীবনে ভালো-মন্দ, সুখ বা বিপর্যয় আসতেই পারে; তবে কোনো অবস্থাতেই নৈতিক অবস্থান থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ নেই। এটা ইসলামের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা।

সালাত মানুষকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে

সালাত ইসলামের একটি মৌলিক ও বাধ্যতামূলক ইবাদাত। সালাত এমন একটি সুন্দর আমল, যা মানুষকে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণ ও আকৃষ্ট করে। কোনো মানুষ যদি নিয়মিত সালাত আদায় করে, তাহলে তার জীবনধারা সব ধরনের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পায়। পাশাপাশি তার শারীরিক অবস্থাও অনেক ভালো থাকে। পবিত্র কুরআন ও রাসূলের (সা.) জীবনাদর্শ বারবার এই বাস্তবতাই প্রমাণ করেছে। যখন আল্লাহ সালাতকে বাধ্যতামূলক ইবাদাত হিসেবে ঘোষণা করেন, তখন সালাতের উপকারিতা ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি কুরআনে বলেন, ‘নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে সব ধরনের অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে।’ প্রকৃতার্থেই সালাত হলো এমন একটি ইবাদাত, যা পাপাচার থেকে দূরে রাখে, অশ্লীলতার হাত থেকে সুরক্ষা দিয়ে শরীর ও মনকে বিশুদ্ধ রাখে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি হাদিসে কুদসি না উল্লেখ করলেই নয়। যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

‘আমি কেবল তারই ইবাদাত কবুল করি, যে নম্রতার চর্চা করে, আমার প্রতি শোকরগুজারি হয়। আমার প্রতিটি সৃষ্টি আর প্রতিটি নিয়ামাতকে মূল্যায়ন করে, আমার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় না, সারাটা দিন আমার স্মরণেই কাটায় এবং গরিব-দুঃখী, মুসাফির, মজলুম এবং অবহেলিত মানুষদের প্রতি দয়া করে।’

জাকাত হলো বিশুদ্ধতার চাবিকাঠি

নিসাব পরিমান সম্পত্তি আছে— এমন স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্যই জাকাত আদায় করা ফরজ। জাকাত এমন কোনো কর ব্যবস্থা নয়, যা মানুষের পকেট কেটে আদায় করা হয়। জাকাতের মূল উদ্দেশ্য হলো দয়া, মানবিক সহানুভূতি এবং পরোপকারের মানসিকতা সৃষ্টি করা। একই সাথে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান তৈরি করা। মানুষকে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করাও জাকাত আদায়ের লক্ষ্য। জাকাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনে সুরা আত তাওবার ১০৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

‘তাদের সম্পত্তি থেকে জাকাত আদায় করা হয়, যেন এই সম্পত্তিগুলো পবিত্র ও বরকতময় হয় এবং পাশাপাশি এই আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পন্ন মানুষগুলোও যেন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যায়।’

জাকাত আদায়ের লক্ষ্য হলো নিজেকে দুনিয়াবি পাপাচার থেকে মুক্ত রাখা এবং একই সাথে সমাজে শালীনতা ও বিশুদ্ধতার চর্চা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে গোটা সামাজিক পরিস্থিতির মান উন্নয়ন করা। সে কারণেই প্রিয়নবি (সা.) জাকাতকে অনেক ব্যপক একটি ইবাদাত হিসেবে গণ্য করতেন এবং আর এ কারণেই সকল সামর্থবান মুসলমানের জন্যই জাকাতকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে।

‘দান বা সাদাকা গুনাহ মিটিয়ে ফেলে, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে।’ (সহিহুল জামে-৫১৩৬)

কাউকে কিছু দান করার গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

‘কারও মুখে হাসি ফোটানো সাদাকা। ভালো কাজ করা এবং অন্যকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখাও সাদাকা। রাস্তায় অন্য কোনো পথচারীর সমস্যা হতে পারে এ আশংকায় সড়ক থেকে হাড়, কাঁটা বা বিপদজনক কিছু দেখে তা অন্যত্র সরিয়ে ফেলাটাও সাদাকা। কোনো তৃষ্ণার্ত মানুষকে পানি পান করানোটাও সাদাকা। এমনকি যদি কাউকে তার গন্তব্যে পৌঁছতে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তাহলে সেটাও সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।’ (বুখারী)

রাসূল (সা.) যে যুগে যে মরুভূমির দেশে রাসূল (সা.) হিসেবে আবির্ভূত হন, সে সময়ের মানুষের সংস্কৃতি ছিল সংঘাতের সংস্কৃতি। বিশেষ করে বেদুঈন এবং মরুভূমিতে বসবাসরত অন্যান্য গোত্রগুলো সবসময়ই নিজেদের মধ্যে নানা ইস্যুতে দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকত। ঠিক সেই সময়ে ইসলামের পবিত্র আহবান নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) হাজির হন। আর তারপর রচিত হলো এক নতুন ইতিহাস। গোটা বিশ্ব সেই ইতিহাস জানে। কীভাবে আইয়ামে জাহেলিয়াতের গতিধারাকে ইসলামের আলোকবর্তিকার স্পর্শে আমূল পাণ্টে দেওয়া হয়েছিল। অন্ধকারে পড়ে থাকা সেই আরবেরাই কীভাবে কালজয়ী আলোকিত মানুষে পরিণত হয়েছিল।

তাকওয়া অর্জনের জন্যই রোজা

ইসলাম রোজা রাখাকেও বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু রোজা রাখার মানে এটাও নয় যে মানুষ তার পার্থিব চাহিদা বা জাগতিক বাসনা থেকে কেবলমাত্র দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় বিরত রাখবে। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবি (সা.) বলেন,

‘রোজা রাখার মানে শুধুমাত্র খাওয়া বা পানাহার থেকে বিরত রাখা নয়; বরং এর পাশাপাশি সব ধরনের নোংরা, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখা। যদি রোজা রাখা অবস্থায় কেউ আপনাকে কোনো খারাপ কথা বলে বা গালি দেয়, তাহলে আপনি তাকে বলে দিন যে, আমি রোজা আছি।’ (রেফারেন্স যুক্ত করতে হবে)

রোজা রাখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

‘তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনটি করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।’ (সূরা আল বাকারা-১৮৩)

হজ্জ দুনিয়ার প্রতি মিছে ভালোবাসাকে হ্রাস করে

অনেক সময় যারা সামর্থবান তারা মনের স্বস্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পুণ্যভূমিতে তীর্থযাত্রা করেন। কিন্তু হজ্জ তেমন কোনো ইবাদাত নয়। ইসলামে সামর্থবান মুসলমানদের জন্য হজ্জকে ফরজ করা হয়েছে। ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হজ্জ। অনেকেই মনে করেন হজ্জের সাথে নৈতিকতা ও চরিত্র উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। হজ্জের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

‘হজ্জের মাসটি সর্বজনবিদিত। এ মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হওয়াও জায়েজ নয়। পাশাপাশি অশোভন কোনো কাজ করা বা কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ করাও হজ্জের সময় জায়েজ নয়। আর এ সময়ে তোমরা যে ভালো কাজগুলো করবে, আল্লাহ সেই সেগুলো জানবেন। তোমরা সেভাবেই তোমাদের পাথেয়গুলোকে সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করার মাঝে কোনো পাপ নেই। (সূরা আল বাকারা: আয়াত ১৯৭)

এ পর্যন্ত আমরা কেবলমাত্র ইসলামের কিছু মৌলিক ইবাদাত বা মূল স্তম্ভগুলোর প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম। এই ইবাদাতগুলোর সামান্য কিছু বিবরণ আমাদেরকে এ সম্যক ধারণাই দিলো যে ধর্মের এই আচারাতিগুলোর সাথে নৈতিকতার সম্পর্কটি কতটা মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

উপরোক্ত ইবাদাতগুলো ধরনের দিক থেকে একটি অপরটির থেকে অনেকটাই ভিন্ন; কিন্তু উদ্দেশ্যের জায়গায় এসে আবার ততটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সেই উদ্দেশ্যটি হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য; যেটা লেখার শুরুতেই বলেছিলাম— সমাজে নৈতিকতা এবং সদাচরণকে প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত করা।

এ কারণেই সালাত, রোজা, জাকাত, হজ্জ কিংবা ইসলামের সকল ইবাদাতই পরিপূর্ণতা অর্জনের পথের একেকটি ধাপ। এই ইবাদাতগুলো মানুষকে পরিচ্ছন্ন করে, বিশুদ্ধ করে, জীবনকেও নিরাপদ ও সুন্দর করে তোলে। ইসলামের কোনো ইবাদাত বা ধর্মীয় আচারাदিকেই নৈতিকতার চেতনা থেকে আলাদা করার সুযোগ নেই। ইসলামে নৈতিকতাকে বরাবরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল একবার বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি রাসূল (সা.)কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর আনুগত্য কর। তার সাথে কাউকে শরীক করোনা। আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছে। প্রত্যেক গাছের নিকট, প্রত্যেক পাথরের নিকট অর্থাৎ সর্বত্রই আল্লাহকে স্মরণ করো। যখনই কোনো অন্যায় করবে তৎক্ষণাৎ কিছু না কিছু ভালো কাজ করো। আর সেই সাথে তোমার স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহার যেন ভালো হয়ে যায়। (ইবনে হাব্বান, হাকিম এবং তিবরানি)

আর যদি ইবাদাতগুলো কোনো মানুষের অন্তরকে বিশুদ্ধ করতে না পারে, যদি এ ইবাদাতগুলো মানুষের ভেতরকার উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোকে বের করে আনতে না পারে, কিংবা এ ইবাদাতগুলো পালন করার পরও যদি আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার সম্পর্কটি সুদৃঢ় না হয়, তাহলে সেই হতভাগা ব্যক্তির জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

পবিত্র কুরআনে সুরা তোয়াহার ৭৪-৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাই বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছেন যে,

‘নিশ্চয়ই যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর কাছে এমন সৎ কর্মশীল ঈমানদার হয়ে হাজির হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। তাদের বসবাসের জন্য এমন বাগান রয়েছে যার তলদেশে দিয়ে বার্না প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।’

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিকতার ঘাটতি দুর্বল ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ

নৈতিকতা না থাকলে ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারেনা। ঈমান হলো এমন একটি শক্তি, এমন একটি বহিঃশিখা যা মানুষকে খারাপ ও নীচু মানের কার্যক্রম থেকে বিরত রাখে এবং পক্ষান্তরে তাকে নৈতিকতার বলে বলীয়ান হয়ে উন্নত মানুষ হওয়ার প্রেরণা যোগায়। এ কারণেই যখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদেরকে ভালো গুনাবলীর দিকে আহবান করেন কিংবা যখনই তিনি তাঁর বান্দাদেরকে খারাপ কিছু থেকে বিরত থাকতে বলেন, তখনই এই কাজগুলোকে তিনি ঈমানের মৌলিক অপরিহার্য চাহিদা হিসেবেই সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরন হিসেবে বলা যায়, যখন পবিত্র কুরআনের সুরা তাওবায় মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথে আহবান জানাতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন,

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সুরা আত তাওবাহ: আয়াত ১১৯)

আল্লাহর নবি (সা.) তাই পরিস্কারভাবেই বলে গেছেন যে, যদি কারও ঈমান ও আকীদা মজবুত হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই তার নৈতিকতাও উন্নত হবে। অন্যদিকে নৈতিকতা তারই নড়বড়ে হবে যার ঈমান দুর্বল হবে। যে মানুষটি অসৎ, যার আচরন ভালো নয় এবং যে কারও ক্ষতির তোয়াক্কা না করে খারাপ কাজ করতেই থাকে, তার ব্যপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘নশ্রতা আর ঈমান একে অপরের পরিপূরক। একটি খোয়া গেলে অপরটি এমনিতেই হারিয়ে যায়।’

একদিন আল্লাহর রাসূল (সা.) একজন আনসার সাহাবীর পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে লোকটি তার ভাইকে তার অসদাচরনের জন্য তিরস্কার করছিল। আল্লাহর রাসূল সেই সাহাবী তিরস্কারের প্রক্রিয়া থেকে বিরত রাখেননি। কেননা নৈতিকতার বিষয়টি ইমানেরই একটি অপরিহার্য দাবী।

যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, কিংবা প্রতিবেশীর কোনো ক্ষতি করে তাকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিষ্ঠুর বলা হয়েছে এবং তাকে পাথর মারারও বিধান রাখা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) এর একটি হাদিসের কথা উল্লেখ করা যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন,

‘সে মুমিন নয়, সে মুমিন নয়, সে মুমিন নয় যে প্রতিবেশীর সাথে অন্যায় করে কিংবা যার ক্ষতির আশংকা থেকে তার প্রতিবেশীও নিরাপদ নয়। (বুখারী)।’

আল্লাহর রাসূল (সা.) সব সময় তার উম্মতকে আজো বাজে কথা বলা থেকে এবং ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় কাজ করা থেকে বিরত থাকার তাগিদ দিয়েছেন।

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং শেষ বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে সে যেন সব সময় ভালো ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।’ (বুখারী)

আর এভাবেই ঈমানের চেতনার উপর ভিত্তি করে এবং ঈমানী চেতনায় বলীয়ান হয়েই নৈতিকতা প্রস্ফুটিত হয় এবং ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানটা অক্ষত থাকে ততক্ষণ নৈতিক ভিত্তিটাও সুরক্ষিত থাকে।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যার চরিত্র যত সুন্দর এবং নিজ পরিবারের সাথে যার ব্যবহার যত নম্র ও কোমল, তার ঈমান ততটাই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ব। (তিরমিজী)

আপনি এমন অনেক মুসলমান আপনার চারিপাশে দেখতে পাবেন যারা অযথা বিতর্কের মধ্যে ডুবে আছে, যাদের মন কলুষিত এবং যাদের ইবাদাত পালনেও ততটা আগ্রহী নয়। অথচ তারা ঠিকই নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে। তারা ফরজ ইবাদাতগুলো পালন করার মধ্যেও অলসতা দেখায় কিন্তু জনসম্মুখে অবশ্য তারা ঠিকই লোক দেখানো ইবাদাত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এ ছলচাতুরী ঠিকই ধরা পড়ে যায় কেননা তাদের আচরন ও কার্যাবলী উন্নত নৈতিকতা ও দৃঢ় ইমানের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

এই ধরনের ব্যক্তিদের ব্যপারে প্রিয়নবি (সা.) সতর্কবানী উচ্চারণ করেছেন এবং উম্মতকেও এ ধরনের ব্যক্তিদের থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন না করেই ইবাদাত করে যান তিনি আসলে ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে ভুল করেন এবং এভাবে নিয়মিতভাবে ভুল করে গেলে সে ব্যক্তির পক্ষে কখনোই কাংখিত মানে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। অনেক সময় ছোটো বাচ্চারাও বড়দের সালাত আদায় দেখতে দেখতে বা তেলাওয়াত শুনতে শুনতে সালাত আদায় করা শিখে যায়। অনেক সময় অভিনেতারাও খুবই আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করেন। কিন্তু বাচ্চাদের সেই সালাত বা অভিনেতাদের অভিনয়ের জন্য আদায় করা সালাত দিয়ে কখনোই সালাতের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারেনা। একটি মাত্র উপায়ে সালাত পড়লে বা ইবাদাত পালন করলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ হবে যদি ইবাদাতকারী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট নৈতিকতা ধারণ করতে পারেন। যার নৈতিকতা উন্নত হবে তার ইবাদাতও উপকারে আসবে। কিন্তু কারও নৈতিকতায় যদি দুর্বলতা থাকে, তাহলে তার ইবাদাতও কোনো কাজে আসবে না।

ইমাম আহমেদ এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘একজন ব্যক্তি একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর নবি, একজন মহিলা আছেন যিনি তার ইবাদাত পালন বিশেষত সালাত ও রোজা সুন্দরভাবে আদায় করে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু তার একটাই দোষ। তিনি প্রতিবেশীদের সাথে খুব রক্ষাভাবে কথা বলেন। আমাদেরকে দয়া করে বলুন যে, তার পরিনতি কি হবে। রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন, এই মহিলা যতই ইবাদাত করুক না কেন সে জাহান্নামে যাবে।

প্রশ্নকারী ব্যক্তি আবার প্রশ্ন করলো, কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল, আরেকজন নারী আছে যিনি ততটা ইবাদাত করেন না, তবে তিনি নিয়মিতভাবে পনির বা মাখন দান করেন। তিনি প্রতিবেশীদেরও ক্ষতি করেন না। আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতে যাবেন।’

রাসূলুল্লাহর (সা.) এ উত্তরগুলো উত্তম চরিত্রের গুরুত্বকেই নির্দেশ করে। এতে আরও বোঝা যায় যে, দান ও সাদাকা হলো এক ধরনের সামষ্টিক ইবাদাত, যার উপকার কোনো ব্যক্তি নয়, বরং গোটা সমাজ ভোগ করে। তাই উত্তম চরিত্র ও দান সাদাকাকে ছোটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। যেহেতু সালাত বা রোজা হলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইবাদাত তাই এই ইবাদাতগুলো পালন করার ক্ষেত্রে বাড়তি বা বড়ো আয়োজনের কোনো সুযোগ নেই। উপরের হাদিসটি থেকে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে রাসূল (সা.) শুধুমাত্র নৈতিকতা ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করার জন্যই কথাগুলো বলেননি। বরং ইবাদতের সত্যিকারের যে রূপ তার সাথে নৈতিকতাকে তিনি সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। কেননা ইবাদাত ও নৈতিকতা একই সাথে হলেই কেবলমাত্র দুনিয়া ও আখেরাতের চূড়ান্ত কল্যান হওয়া সম্ভব।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর বান্দা ইবাদতে দুর্বল হওয়া স্বত্বেও তার চারিত্রিক সততা দ্বারা আখেরাতে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে পারে পক্ষান্তরে সে তার অসৎ চরিত্রের কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে বিক্ষিপ্ত হয়। (তাবরানী)

নৈতিকতার সংকট অন্য যে কোনো সংকটের তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। রাসূল (সা.) সব সময় নৈতিকতার কথা বলে গেছেন এবং উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করে গেছেন যাতে নৈতিকতার গুরুত্বের বিষয়টি ব্যক্তির মনে গেঁথে যায়। সেই সাথে সবাই যেন অনুধাবন করতে পারে যে ইমান, কল্যান এবং নৈতিকতা আসলে একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

কে দরিদ্র?

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা কি জানো দরিদ্র কে? উপস্থিত লোকেরা বললো, আমাদের ভেতরে দরিদ্র হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার নগদ অর্থও নেই, কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তিও নেই। রাসূল (সা.) বললেন, আসল দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন সালাত, রোজা, ও যাকাত সাথে নিয়ে যাবে, কিন্তু এমন অবস্থায় যাবে যে সে একই সংগে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে, কারও রক্ত বারিয়েছে, অথবা কাউকে মারপিট করেছে।

এমতাবস্থায় সে যাদের ক্ষতি করে যাবে, তাদের এক একজনকে এই ব্যক্তির সব নেক কাজগুলো ভাগ করে দেওয়া হবে। এভাবে দিতে দিতে তার দায় মুক্ত হওয়ার আগে যদি তার নেক আমলগুলো শেষ হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের গুনাহগুলো সেই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, তিরমিজী)

এই ধরনের হতভাগা মুসলমান ব্যক্তিটিই হলেন সর্বাধিক দরিদ্র। তার অবস্থা হলো সেই ব্যবসায়ীর মত যার হাতে হয়তো এক হাজার টাকার সম্পদ আছে কিন্তু তার দেনার পরিমাণ হলো দুই হাজার টাকা। এ ধরনের ব্যক্তিকে তাহলে কীভাবে ধনী বলা যাবে?

যে ধার্মিক ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আমল করে, কিন্তু সেই আমলগুলো করার পাশাপাশি যিনি বাজে কাজগুলোও একইভাবে চালিয়ে যায়, মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার অব্যহত রাখে, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সাথে অন্যায় আচরণ করে, তাকে কীভাবে একজন ভালো মানুষ বলা যায়?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, পানি যেভাবে বরফকে গলিয়ে দেয়, সৎ চরিত্র সেইভাবে গুনাহগুলোকে নষ্ট করে দেয়। আর সিরকা বা ভিনিগার যেভাবে মধুকে নষ্ট করে দেয়, অসৎ চরিত্র ঠিক সেইভাবেই নেক আমলগুলোকে নষ্ট করে দেয়। (তিবরানী ও বায়হাকি)

যখন মানুষের ভেতরকার প্রতারনামূলক আচরণ বৃদ্ধি পায় এবং যখন এই প্রতারনা জনিত ক্ষতি এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন আসলে মানুষটি তার ধর্ম থেকে বা ধর্মীয় চেতনা থেকে এমনভাবে বের হয়ে আসে যেন সে কাপড় ছেড়ে নগ্ন হয়ে যায়। তখন সে নিজেকে যতই ন্যায়বান বা ভালো মানুষ বলে দাবী করুক না কেন তা আর কেউ গ্রহণ করেনা। কীভাবে এটা সম্ভব যে, একজন মানুষ দাবী করবে যে সে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছে আবার সেই মানুষটি একইসাথে নানা ধরনের দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। নৈতিকতা এবং ঈমানের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সম্পর্কটি রাসূলের (সা.) এই হাদিসটি দিয়েও প্রমাণ হয়। প্রিয়নবি (সা.) বলেছেন,

‘যদি কোনো মানুষ সালাত, রোজা কিংবা হজ্জ পালন করে তথাপিও তাকে ভদ্দ বা প্রতারক বলা যায় যদি তার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। এগুলো হলো, যখন সে কথা বলে সে মিথ্যা বলে, যখন সে ওয়াদা করে তা সে ভঙ্গ করে এবং সে অন্যের আমানত বা আস্তা নষ্ট কওে বা চুক্তি ভংগ করে।’ (মুসলিম)

আরেকটি হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন,

‘চারটি বৈশিষ্ট্য থাকলে একজন ব্যক্তিকে ভদ্দ বা প্রতারক বলা যায়। এমনকি এর কোনটিই যদি কারও ভেতরে থাকে তাহলে তার ধ্বংস ও বিচ্যুতি অনিবার্য। এগুলো হলো, যখন সে অন্যের আমানতের খেয়ানত করে, মিথ্যা কথা বলে, চুক্তি করলে তা ভংগ করে এবং কোথাও কোনো ঝগড়ায় লিপ্ত হলে সে গালি গালাজ শুরু করে। (বুখারী)

তৃতীয় অধ্যায়

একজন অনুকরণীয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব কেমন হতে পারে

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নৈতিক শিক্ষা এ কথাই ইংগিত করে যে ইসলাম মানুষের জীবনকে মহৎ গুনাবলী ও সদাচরনের আলোয় আলোকিত করতে চায়। তাদের চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধন করতে চায়। আর অনন্য সাধারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো একজন মানুষ অর্জন করতে পাও কেবলমাত্র আল্লাহর রাসূলের (সা.) জীবনকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে। যদি কোনো মুসলমান এই প্রক্রিয়ার বাইরে যেতে চায় বা ভিন্নতর কিছু করতে চায় তাহলে সে ধর্মীয় চেতনার বাইরে চলে যাবে এবং ইমান থেকেও বিচ্যুত হবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে নৈতিকতার বিষয়টি কোনো আরাম আয়েশ বা বিলাসিতার মত বিষয় নয়, যা না হলেও আমাদের চলে। বরং নৈতিকতা হলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা একটি ধর্মকে অবশ্যই ধারণ করতে হয় এবং কোনো কোন ক্ষেত্রে সেটাকে আরও এগিয়ে নিতে হয়। ইসলাম এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগামী তাই যারা ইসলামকে মানেন ও অনুসরণ করেন তাদেরকে এই নৈতিকতা এবং উন্নত গুনাবলীকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই পালন করতে হবে। যদি আমরা নৈতিক চরিত্র নিয়ে রাসূলের (সা.) সব হাদিসগুলোকে এক জায়গায় আনি, তাহলে সেটা হয়তো বিরাট একটা বই হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, অনেক চিন্তাশীল মানুষই এখনো ইসলামের এই নৈতিক দিকটি সম্পর্কে ভালমত জানেনা।

নৈতিক চরিত্রের বিস্তারিত বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা আসুন এ বিষয়ে রাসূল (সা.) এর আরও দু একটা হাদিস জেনে নেই।

হযরত উসামা বিন শারিক (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন আমরা রাসূলুল্লাহর (সা.) খুবই চুপচাপ হয়ে বসে ছিলাম। একেবারে পিন পতন নিরবতা। এমন সময় কিছু মানুষ এলেন এবং প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা কে? রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন, সেই মানুষ যার চরিত্র উত্তম। (ইবনে হাবান)

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে। সেই মানুষগুলো প্রশ্ন করলো, বলুন তো দেখি, মানুষকে আল্লাহ সর্বোত্তম কোনো বৈশিষ্ট্যটি দান করেছেন। রাসূল (সা.) বললেন, উত্তম চরিত্র। (তিরমিজী)

নবিকে (সা.) প্রশ্ন করা হয়েছে, কোনো মুসলমানের ঈমান সবচেয়ে সুদৃঢ়? রাসূল (সা.) উত্তরে বলেন, সেই মুসলমান যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। (তিবরানী)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (সা.) আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো যে কোনো ব্যক্তি আমার সবচেয়ে প্রিয় কিংবা শেষ বিচারের দিনে কে আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে? এই প্রশ্নটি তিনি নিজ থেকেই সেদিন দু-তিনবার করেছিলেন। সবাই তার কাছে উত্তর জানতে চাইলো। তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে উন্নত।’ (আহমাদ)

আরেকটি হাদিসে তিনি বলেছেন,

‘কিয়ামতের দিন একজন মুমিনের জন্য তার উত্তম চরিত্রের চেয়ে আর ভারী ও ওজনদার কিছুই হবে না। আল্লাহ তায়ালা অশ্লীলতা ও কটু ভাষীদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না। যার চরিত্র ভাল, তার সালাত, রোজা ও অন্যান্য ইবাদতের মানও উত্তমই হবে। (ইমাম আহমাদ)’

চরিত্রের সংস্কার সাধনের জন্য কাজ করছেন এমন কারও পক্ষ থেকে এই ধরনের শিক্ষা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যপার হলো, নৈতিকতার এই শিক্ষাটি এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে, যিনি নতুন ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস ছড়িয়ে দেয়ার মিশন নিয়ে কাজ করছেন। কেননা যেখানে প্রচলিত অন্য সব ধর্ম, ধর্মীয় আচারাди পালনের দিকে বেশি নজর দেয়, সেখানে ইসলাম সকল ইবাদাত ও আমলের পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়েছে উত্তম চরিত্রকে। রাসূল (সা.) তার দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন এমন কিছু রাষ্ট্র প্রধানকে যারা নানা ধরনের দেব-দেবীর পূজায় লিপ্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবত প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। সেই বাস্তবতায় ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা যখন ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিলো এবং বিভিন্ন যুদ্ধে ও অভিযানে যখন মুসলমানরা সফলতা লাভ করছিলো ঠিক তখনও আল্লাহর রাসূল (সা.) চরিত্র সাধনের কথাই বার বার বলে গেছেন। এতে বোঝা যায়, ইসলামে নৈতিকতা ও উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভের গুরুত্ব কতটা বেশি।

কেননা প্রকৃতার্থে ধর্ম বলতে যদি বান্দার সাথে তার খোদার সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করাকে বোঝায়, তাহলে একই সাথে একজন মানুষের সাথে অপরের সুসম্পর্কটাও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নির্ধারিত হওয়াটা আবশ্যিক। কেননা বেশির ভাগ ধর্মই মানুষের সাথে মানুষের ব্যবহার বা নম্রতা বা উত্তম চরিত্রের চেয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। যেমন অধিকাংশ ধর্মেরই কথার ধরন এমন, আপনি যদি এই ধর্ম মানেন তাহলে আপনার যাবতীয় পাপ ধুয়ে মুছে যাবে কিংবা আপনি এই আমল বা উপাসনা করলে আপনার ভুলগুলো সব বাতিল হয়ে যাবে।

কিন্তু ইসলাম এত সাদামাটা চিন্তার কথা বলেনা। ইসলামের মতে ইবাদাত তখনই কবুল হবে কিংবা ইবাদতের মাধ্যমে পাপ তখনই বিলীন হবে যখন আমলদার ব্যক্তি উৎকৃষ্ট গুণাবলী অর্জন করতে পারবেন কিংবা তিনি অপরের হকগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করতে পারবেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, গুনাহ কাটানোর একমাত্র উপায় হলো পূন্যময় কাজ। এ ধরনের কাজ করলেই একজন মুমিন তার কাংখিত মানে পৌছাতে পারে। রাসূল (সা.) বার বার এই নীতির উপর জোর দিয়েছেন যাতে উম্মাহ নৈতিকতার কদর বুঝতে পারে, যাতে তাদের নৈতিকতা সমুন্নত থাকে এবং চরিত্রকে আরও উন্নত করার জন্য উম্মাহর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। চারিত্রিক উৎকর্ষতার বিষয়কে এড়িয়ে গিয়ে উম্মাহ যেন সাধারণ ধর্মীয় আচারাди পালনে বেশি ব্যস্ত না হয়।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর একজন বান্দা ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা কমতি থাকার পরও শুধুমাত্র তার উত্তম চরিত্রের কারণেও আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারেন। কিন্তু চরিত্র যদি খারাপ হয় তাহলে তাকে জাহান্নামের নীচু স্তরেই ছুড়ে ফেলা হবে। (তিবরানী)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হে মুমিনগন, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র উত্তম চরিত্রের বদৌলতে সালাত ও রোজা পালনকারী বান্দার মত একই মাপের সম্মান পেয়ে যেতে পারে। (আবু দাউদ)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি। একজন মুসলমান যিনি ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে খুব আহামরি নয়, অনেকটা মাঝারি মানের। তিনি শুধুমাত্র উত্তম চরিত্রের উপর ভর করে আখেরাতে হয়তো সেই মানুষটার মতই মর্যাদার অধিকারী হবেন যিনি নিয়মিত রোজা রাখেন এবং সারারাত জেগে ইবাদাত করেন। (আহমাদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে উদ্ধৃত করে বলেন, একজন মুমিন বান্দার মহত্ত্ব হলো তার ধার্মিকতা, তার বুদ্ধিমত্তা হলো সহনশীলতা আর তার বংশ পরিচয় বোঝা যায় তার চরিত্র দিয়েই। (হাকীম)

হযরত আবু জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, সফল ব্যক্তি তো সেই যে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে তার অন্তরকে বিশুদ্ধ করে, তার মনকে সবসময় সুপথে পরিচালনা করে, সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে, সবসময় শুকুর গুজারী থাকে এবং তার স্বভাব ও আচরণও কোমল থাকে। (ইবনে হাবান)

সাধারণ কিছু মৌলিক উপদেশ কিংবা এটা করো বা এটা করোনা- এই নির্দেশনাগুলো সমাজে উত্তম চরিত্রের ভিত রচনা করতে পারেনা। কেননা শুধু এই বিষয়গুলোই মানুষের আচরণকে ভালো করার জন্য যথেষ্ট নয়। আপনি একটা সমাজে শুধু ভালো কাজ করতে বলবেন আর খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবেন- আর সমাজ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে- এটাও কোনো বাস্তব কথা নয়। আপনার সদুপদেশকে বাস্তবায়ন এবং কার্যকর করতে হলে চাই দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং নিরবিচ্ছিন্ন তত্ত্বাবধান। আর প্রশিক্ষণ কখনোই কার্যকরী হবেনা যদি না সমাজে তার বাস্তব প্রতিফলন না দেখা যায়। শুধু প্রশিক্ষণ দিয়েই মানুষের আস্থা পাওয়া যাবেনা। কেননা যিনি ভালো পরামর্শ দিচ্ছেন তার চরিত্র যদি ভালো না হয় তাহলে তার চারিপাশে

পরামর্শদাতা ব্যক্তির ব্যাপারে কখনোই ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হবেনা। সঠিক ও কার্যকর প্রশিক্ষণ তিনি দিতে পারেন যার সেই ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে। যিনি তার উত্তম চরিত্র দ্বারা আশেপাশের মানুষকে সম্মোহিত করে রাখতে পারেন। তার জীবন যাপন যদি তার কথার সাথে মিলে যায় তাহলে মানুষ এমনিতেই তাকে অনুসরণ করার তাগিদ অনুভব করবে।

দায়িত্বশীলদের ব্যাপারেও একই রকম ঘটে। একজন নেতা যদি তার কর্মীদের উত্তম চরিত্র গঠন করতে চান তাহলে এটা অপরিহার্য যে নেতাকেও একই ধরনের চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। যেমন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজেই ছিলেন উত্তম চরিত্রের জীবন্ত উদাহরণ। তিনি তার সংগী সাথীদেরকে কোনো উপদেশ দেয়ার আগে নিজের জীবনে তার অনুশীলন নিশ্চিত করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আচরনে কখনোই দুর্ব্যবহার পাওয়া যেতনা। তিনি কঠোর বা রক্ষ ছিলেন না মোটেও।

রাসূল (সা.) সবসময়ই বলতেন যে তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই যার চরিত্র উত্তম। (বুখারী)

আনাস (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের (সা.) কাছাকাছি ১০ বছর থাকার সুযোগ পেয়েছি। আমি এই সময়ের মধ্যে তাকে বিরক্তি বা রাগের কারণে একবার উফ শব্দটা উচ্চারণ করতেও শুনিনি। এমনকি আমি কি করেছি বা কেন করেছি- এমন ধরনের প্রশ্নও তিনি করতেন না।’

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। যদি কখনো কোনো কাজে দুটি উপায় বা অপশন থাকতো তাহলে রাসূল (সা.) সবসময় সহজটাকেই বেছে নিতেন যদি না তাতে কোনো পাপের সম্ভাবনা না থাকে। যদি সহজ কাজটিতে গুনাহ’র কোনো সম্ভাবনা থাকে তাহলে তিনি ভুলেও সেটা করার কথা ভাবতেন না। রাসূল (সা.) কখনো কারও উপর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতেন না। আল্লাহ যদি কাউকে অমান্য করার কথা বলতেন, তাহলেই শুধু রাসূল (সা.) তাকে অমান্য করতেন তবে সেক্ষেত্রেও তার আচরন ছিল বিন্দ্র। রাসূল (সা.) নিজে কখনোই কাউকে সরাসরি তার হাত দিয়ে মারতে যাননি। তার স্ত্রী কিংবা দাসদের গায়েও হাত তুলেননি। তবে তিনি আল্লাহর হুকুমে, আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। (মুসলিম)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূল (সা.) এর সাথে হাটছিলাম। তার শরীরে সে সময় একটি মোটা চাদর পেচানো ছিল। এমন সময় একজন আরব এত জোরে তার চাদরটি টান দিল যে তার কাঁধের একটি অংশ অনাবৃত হয়ে গেল। আমি এভাবে চাদরটি টানার দৃশ্য দেখে হতবিহবল হয়ে পড়লাম। আরবটি রাসূলকে (সা.) বললো, ও মুহাম্মাদ! আল্লাহ তোমায় যে সম্পত্তি দিয়েছেন তার থেকে আমাকে কিছু ভাগ দাও। রাসূল (সা.) তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে হাসলেন আর ঐ আরবকে কিছু দান করে দিতে বললেন। (বুখারী)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ নিজে কোমল, তাই তিনি কোমলতা, নম্রতা ও বিনয় পছন্দ করেন। বিশেষ করে যারা কারও কঠোর আচরনের প্রতিক্রিয়ায় নম্রতা দেখাতে পারে তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। (মুসলিম)

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে কোনো কিছুতেই যদি নম্রতা থাকে তাহলে জিনিষটা সুন্দর হয়। আর যদি সেখান থেকে নম্রতাকে বের করে নেওয়া হয় তাহলে বিষয়টা কুৎসিত আকার ধারণ করে।

হযরত জারির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, নম্রতার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে পুরস্কার বরাদ্দ রেখেছেন তা আর অন্য কোনো কিছু দিয়েই পাওয়া যাবে না। যখন আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে অতিরিক্ত পছন্দ করেন তখন তাকে কোমলতা দান করেন। যেসব পরিবারে নম্রতা কম থাকে তারা অন্যসব নেকী থেকেও বঞ্চিত থাকে। (তিবরানী)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলের (সা.) মত হাসিমুখে আর কাউকেই থাকতে দেখিনি। (তিরমিজী)

হযরত আয়েশাকে (রা.) একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, বাড়িতে থাকলে রাসূল (সা.) কি করতেন। আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, নবিজি বাড়িতে থাকলে বাড়ির লোকদেরকে সাহায্য করতেন। যখন সালাতের সময় হতো, তখন তিনি অজু করে সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন। (মুসলিম)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলের (সা.) ব্যবহার ও আচরন ছিল সবার চেয়ে উত্তম। আমি আবু উমায়ের নামক একজনকে ভাই হিসেবে দত্তক নিয়েছিলাম। তার একটি অসুস্থ পাখি ছিল যার নাম ছিল নাঘির। রাসূল (সা.) সবসময়ই আমার সেই পালিত ভাই ও তার পাখির সাথে খেলা করতেন। আমার ভাইটিকে দেখলেই রাসূল (সা.) প্রশ্ন করতেন হে আবু উমায়ের, তোমার নাঘিরের কি খবর, ও কেমন আছে? (বুখারী)

রাসূলের (সা.) যেসব গুণাবলীর কথা আমরা জানতে পারি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে গুণটা সম্পর্কে জানা যায় তাহলো তার মানবিকতা। কোনো কিছুর উপর তার লোভ ছিল না। তিনি ছিলেন অসম্ভব সাহসী ও বীরোচিত। তিনি সত্য বলতে ও সত্যের পথে দাঁড়াতে কখনো বিচলিত হতেন না। তিনি ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। তার মনে ভালোবাসা ছিল অফুরান। তিনি কখনো কারও প্রতি অন্যায় করেননি। তার গোটা জীবনটাই ছিল সততা আর বিশ্বস্ততার জ্বলন্ত উদাহরণ।

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলমানদেরকে সেই একইমানের উত্তম চরিত্র ধারণ করার তাগিদ দিয়েছেন এবং সেই ব্যপারে রাসূলের (সা.) জীবন থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

‘যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের উপর ইমান এনেছে এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলের (সা.) জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।’ (সূরা আল আহযাব: আয়াত ২১)

প্রকৃতার্থেই রাসূল (সা.) ছিলেন সবচেয়ে ভালো ব্যবহারের, সবচেয়ে বেশি মানবসেবামুখী ও মানবতাবাদী এবং সাহসী মানুষ। একবার মদিনার লোকদের ঘুম প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে গেলো। সম্ভবত তারা প্রচণ্ড কোনো আওয়াজ শুনেছিলেন। শব্দটা যেদিক থেকে এলো তার কারনটা জানার জন্য মানুষজন সেপথে হাটতে শুরু করলো। তারা কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলো রাসূল (সা.) নিজেই সেদিক থেকে ফিরে আসছেন। রাসূল (সা.) সেসময় হযরত আবু তালহার ঘোড়ায় বসা। সমস্যাটা কি শোনার জন্য তিনি এতটাই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েছেন যে ঘোড়ার জিনটাও লাগানো হয়নি। শুধু একটি তরবারী নিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ অন্য কেউ যাওয়ার আগে তিনি নিজেই সেখানে চলে গিয়েছেন। তারপর যখন তিনি ফিরে আসছিলেন তখনই রাস্তায় অন্য লোকদের সাথে তার দেখা হলো। রাসূল (সা.) তাদেরকে অভয় দিয়ে বললেন যে, ঘাবড়ানোর মত কিছু হয়নি। সব ঠিক আছে।

হযরত আলী (রা.) বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন যুদ্ধ শুরু হতো, আমরা নবিজিকে নিয়ে পেরেশানিতে পড়ে যেতাম। কেননা মানুষটি আমাদের সবার আগেই শত্রুর মোকাবেলায় নেমে যেতেন।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলের (সা.) কাছে কোনো কিছু নিয়ে অনুরোধ করা হলে তিনি কখনোই না বলতেন না।

প্রথমবারের মত ওহী নাজিলের পর রাসূল (সা.) যখন উত্তেজনায় আর উদ্বিগ্নতায় দিশেহারা হয়ে পড়েন তখন হযরত খাদিজা (রা.) তাকে স্বাস্থ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘আপনি সব সময় অসহায় ও মজলুমদের পাশে থাকেন, তাদের কষ্ট লাঘব করেন, আপনি দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে দান করেন, কেউ কোনো বিপদে পড়লে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ান, তাই আপনার কোনো বিপদ হবে না।’

একবার রাসূল (সা.) ৭০ হাজার দিরহাম পেয়েছিলেন। এগুলো সবই তার সামনে একটা মাদুরের উপর রাখা ছিল। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেগুলো দান করে দিচ্ছিলেন। যতক্ষণ না তার হাতে একটি দিরহামও অবশিষ্ট ছিল তিনি কাউকে না করছিলেন না। একেবারে সব শেষ হওয়ার পর একজন মানুষ এসে তার কাছে সাহায্য চাইলো। নবিজি (সা.) বললেন, আমার কাছে দেয়ার মত আর কিছুই বাকি নেই। তুমি আমার নামে কিছু একটা কিনে নাও। আমি হাতে টাকা পেলেই সেই টাকাটা শোধ করে দিবো। তার এ কথা শুনে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা হযরত উমর (রা.) থাকে বললেন, আপনার সাধ্য নেই এমন কিছু করাকে আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেননি। হযরত উমরের (রা.) এই কথায় রাসূলের (সা.) মন একটু খারাপ হলো। একজন আনসার সাহাবী তখন নবিজিকে (সা.) বললেন, আপনি ব্যয় করেন এবং পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে কোনো ভয় পাবেন না। রাসূল (সা.) আনসারের এই কথায় স্বস্তি পেলেন এবং বললেন, আমি এভাবে চলার জন্যই আদিষ্ট হয়েছি।’

প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তার সংগী সাথী ও সাহাবীদেরকে অসম্ভব রকম ভালোবাসতেন। তিনি কারও প্রতি ঘৃণা রাখতেন না। যে কোনো জাতির বা গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে

তিনিও সম্মান করতেন। তিনি প্রতিটি সাহাবীকেই অনেক বেশি সম্মানও করতেন। ফলে প্রত্যেক সাহাবীই মনে করতেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বোধ হয় তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তার সংস্পর্শে কেউ এলে তিনি তাকে ধৈর্যশীল হওয়ার পরামর্শ দিতেন। যদি কেউ তার কাছ থেকে কিছু চাইতো তাহলে নবিজি তাকে সেটা দিয়ে দিতেন আর দিতে না পারলে এত মোলায়েমভাবে তার সাথে কথা বলতেন যে ব্যক্তি নিজেই সন্তুষ্ট হয়ে যেত। নবিজির দয়ার দরিয়া যেন প্রত্যেককেই স্পর্শ করতো। সাহাবীদের জন্য তিনি ছিলেন একজন উত্তম অভিভাবক। তার কাছে সকলেই ছিল সমান। রাসূলুল্লাহ (সা.) দেখতে ছিলেন সুদর্শন, মার্জিত, বিনম্র এবং নরম হৃদয়ের মানুষ। তিনি মানসিকভাবে মোটেও কঠোর বা সংকীর্ণমনা ছিলেন না। তিনি কখনো কারও সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতেন না। তার মুখে কেউ কখনো অশ্লীল শব্দ শুনেনি। কারও গীবত করা, নিন্দা করা কিংবা কারও মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা ছিল তার স্বভাব বিরোধী। তিনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যপারে মাথা ঘামাতেন না। হতাশা বা নৈরাশ্যবাদও তাকে কখনো গ্রাস করতোনা।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, পৃথিবীতে আর কেউ নেই, কখনো আসবেনা যার চরিত্র নবিজির চরিত্রের চেয়ে উত্তম। যখনই কেউ তাকে ডাকতো, তিনি সাথে সাথেই তার জবাব দিতেন। হযরত জারির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমাকে কখনোই তার কাছে যাওয়া থেকে বিরত করেননি। কখনো যেতে না করেননি। যখনই তিনি আমার দিকে তাকাতেন, মুচকি হাসি দিয়েই তাকাতেন। তিনি তার সংগীদের সাথে কথা বলতে, ভাবনার শেয়ার করতে পছন্দ করতেন। তাদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ আচরন করতেন। তাদের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করতেন। বাচ্চাদেরকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। বাচ্চা দেখলেই কোলে তুলে নিয়ে তিনি তাদের আদর করতেন। সমাজের যে স্তরের মানুষই তাকে দাওয়াত করতো, তিনি তা কবুল করতেন। তিনি মদিনার আনাচে কানাচে গিয়ে অসুস্থ ও পক্ষাগাতগ্রস্ত রোগীদের দেখে আসতেন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, যদি তার কানে কেউ কিছু বলতে আসতো তাহলে যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি মুখ সরিয়ে না নেয়, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত কান পেতেই রাখতেন। যখন তার হাত কেউ ধরতো বা হাত মেলাতো সেই ব্যক্তি হাত না সরিয়ে ফেলা পর্যন্ত তিনি হাত ধরেই রাখতেন। তিনি সবার আগে সালাম দিতেন। সালাম দেয়ার প্রতিযোগিতায় তাকে কেউ হারাতে পারতোনা। বাসায় মেহমান আসলে হয়তো তাকে ভালো কুশন বা ভালো জামাটি দিয়ে নিজে মাটিতে শুতেন। তিনি নতুন শিশুর নামকরণ করতেন। সাহাবীদেরকে সুন্দর সুন্দর নামে অভিহিত করে সেই নামেই তাদেরকে ডাকতেন তিনি। কেউ কথা বলতে শুরু করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কথা বলতেননা। নবিজি কারও কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দেননি কখনো।

প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজার (রা.) প্রতি নবিজির ভালোবাসা ছিল অফুরান। হযরত আয়েশা (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

‘আমি কোনো নারীকে ইর্ষা করিনা। সেটার সুযোগ নেই। থাকলে আমি খাদিজাকেই ইর্ষা করতাম। আমি রাসূলের (সা.) মুখে বহুবার এই মহিয়ষী নারীর প্রশংসা শুনেছি। এমনকি বিবি খাদিজার ইন্তেকালের পরও যখনই কোনো দুম্মা জবাই হতো, নবিজি সেই দুম্মার গোশতগুলো হযরত খাদিজার (রা.) নানা সংগীর কাছে উপহার হিসেবে পাঠাতেন। একবার হযরত খাদিজার (রা.) বোন আমাদের বাসায় আসতে চাইলো। নবিজি তাকে দাওয়াত দিলেন এবং তাকে দেখে খুবই খুশী হলেন। সেই মহিলা চলে যাওয়ার পর রাসূল (সা.) বললেন, খাদিজা যখন জীবিত ছিল এই মহিলা প্রায়শই তখন আসতো। সুসম্পর্ক এভাবেই ধরে রাখতে হয় কেননা সুসম্পর্কই হলো ইমানের নিদর্শন।

রাসূল (সা.) তার আত্মীয় পরিজনদের প্রতিও খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাদেরকে তিনি অন্যায় কোনো সুবিধা দিতেন না। এমনকি যারা উত্তম ব্যক্তি তাদের চেয়ে নিজের আত্মীয়দেরকে কখনোই তিনি অগ্রাধিকার দেননি।

হযরত আবু কাতাওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে একটি দল মদিনায় বেড়াতে আসলো। রাসূল (সা.) নিজেই দাঁড়িয়ে গেলেন তাদের মেহমানদারি করার জন্য। সাহাবীরা বললেন, আপনি অস্থির হবেন না। আমরা যে কয়জন আছি তাতে বেশ ভালভাবেই তাদের খাতির যত্ন করতে পারবো। রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন, তারা আমার সাহাবীদেরকে সম্মান দিয়েছিলো তাই আমি নিজেই তাদের সেবা করবো।

অন্য এক বর্ণনা এসেছে হযরত উসামার (রা.) মাধ্যমে। একবার সাহাবীরা এক জায়গায় বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূল (সা.) সেখানে আসলেন। সাহাবীরা তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূল (সা.) এই দৃশ্য দেখে বললেন, এভাবে দাঁড়িওনা। অনারবদের সংস্কৃতির মত কাউকে সম্মান জানানোর জন্য উঠে দাঁড়িওনা। আমি আল্লাহর একজন বান্দা। একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে খায় আমিও সেভাবেই খাই। অন্যরা যেভাবে বসে, আমিও সেভাবেই বসি।

রাসূল (সা.) অধীনস্ত সেবকদের ব্যপারে অতিরিক্ত যত্নবান ছিলেন। তিনি দরিদ্রদের খোঁজ নিতেন। তার কোনো আলোচনায় কোনো অভাবী বা ভিক্ষুক এসে বসলে তিনি কখনোই তাদেরকে উঠিয়ে দিতেন না। তিনি তার সাহাবীদের সাথে খোলা মনে মিশতেন। কোনো বৈঠক শেষ হলেই তিনি ছুট করে উঠে যেতেন না। বরং একই জায়গায় আরও কিছুটা সময় বসতেন। তিনি কোনো সুসংবাদে আরও বেশি বিনম্র হতেন। যখন মক্কা বিজয় হলো, সাহাবীরা দলে দলে বিজয়ের স্বাদ নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) উটের উপর মাথা নীচু করে বসেছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রতি এতটাই শুকুরগুজারী ছিলেন যে তার মাথা আর উঁচুই করতে পারছিলেন না। মাথা এতটাই নীচু ছিল যে তার খুতনিটা উটের পিঠের সাথে যেন লেগে যাচ্ছিলো।

তিনি ছিলেন নরম স্বভাবের একজন মানুষ। যদি তার সাথে কেউ রাগতস্বরে কথা বলতো, তিনি বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি হাসিমুখে থাকতেন সবসময়। তিনি সরাসরি, ভনিতা না করে কথা বলতেন। তার যে কোনো আলোচনা থেকেই সহিঁতা, সততা, আমানতদারিতা এবং ইনসাফের শিক্ষা পাওয়া যায়। তিনি উচ্চ স্বরে কথা বলতেননা। কারও পিছনে তিনি কথা বলতেন না। যখনই তিনি কথা বলতেন, সেই কথার জাদু এতটাই আকর্ষণীয় ছিল যে শ্রোতারা এমনিতেই নীরব হয়ে যেতেন। তিনি খুব সুন্দরভাবে হাটতেন। তার হাটা চলায় তাড়াহুড়ো ছিলনা, আবার অলসতাও ছিলনা।

হযরত ইবনে আবু হালা বলেন, তার নীরবতা ছিলো ধৈর্য্য, দূরদর্শীতা, পর্যবেক্ষন, চিন্তা ও গভীর ধ্যানের বহিপ্রকাশ। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) এভাবে কথা বলতেন যেন শ্রোতারা তার প্রতিটি শব্দ অনুধাবন করতে পারতো। রাসূল (সা.) সুগন্ধি পছন্দ ও ব্যবহার করতেন। তিনি গোটা পৃথিবী জয় করেছেন, অসংখ্য যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন, কিন্তু প্রাচুর্যতা ও বিলাসিতা তাকে কখনোই স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার ঘরে একটি পানি পানের পাত্র ছাড়া আর তেমন কিছুই ছিলনা।

চতুর্থ অধ্যায়

জান্নাতের পথে নাকি জাহান্নামের পথে

প্রথম উদ্দেশ্য- আত্মসংস্কার:

ইসলাম অন্য যে কোনো ব্যাপকতর সংস্কারমূলক কার্যক্রম শুরু করার আগে ব্যক্তির নিজের সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ব্যক্তি মানুষকেই ইসলাম তার কার্যক্রমের প্রাথমিক নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে। তাই ব্যক্তির অভ্যন্তরে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেয়ার জন্য ইসলাম চেষ্টা চালায়, যাতে ব্যক্তি বাহ্যিক জগত আর তার আভ্যন্তরীণ সংস্কার একই সাথে অব্যাহত রাখে। রাসূলুল্লাহর (সা.) প্রদর্শিত সেই শিক্ষাগুলো কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। ইসলামের শিক্ষাগুলো আরোপিত নয়, আবার এমনও নয় যাকে অবলিলায় মানুষের প্রাত্যাহিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়। ইসলামের এই শিক্ষাগুলো কোনো অংকিত ছবি নয় যা সময়ের সাথে সাথে হালকা হতে থাকবে। বরং এ শিক্ষাগুলো মানুষের একেবারে হৃদয়ে সুনিপুনভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়। কারও অন্তরে এ শিক্ষাগুলো বহাল থাকলে তা সেই মানুষের মনে অনেক বেশি শক্তির সৃষ্টি করে যা তাকে দুরাচার ও অন্যায় থেকে তাকে সুরক্ষা করে এবং পাশাপাশি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

অনেক সময় অনেক ধর্মই প্রচলিত সমাজ, সামাজিক কাঠামো, সরকার কিংবা সরকারের অনেক কৌশলের ব্যপারে আপত্তি উত্থাপন করে। ধর্মগুলো এগুলোর ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্ত করার নানা ধরনের উপায়ও বলে দেয়। তবে প্রকৃত ধর্ম সবসময় ন্যায় ভিত্তিক ব্যক্তিত্বকেই সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে এবং উত্তম চরিত্রকেই সভ্যতা বিনির্মান ও তার সুরক্ষার স্থায়ী গ্যারান্টি মনে করে। এর মানে আবার এটাও নয় যে যারা সুশাসন এবং সুসমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের উদ্যোগগুলোকে ছোটো করে দেখা হচ্ছে। এখানে বরং এটা বোঝানো হচ্ছে যে একটি সুন্দর ও উন্নত জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তির নিজস্ব সংস্কারটাও ভীষনভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তির ভেতরটা যদি কালো হয়, নোংরা হয় তাহলে তা সমাজে, সরকারে এমনকি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও খারাপ প্রভাব ফেলে। কেননা এ ধরনের ব্যক্তি তখন আইন ও সিস্টেমকে তার কুরুচিপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহার করে।

পক্ষান্তরে ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ হন এবং তার ভেতরটা যদি উন্নত হয় তাহলে তিনি পরিবেশের উন্নতিকল্পে এবং এর সংশোধন করার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন। এরকম ব্যক্তির সংখ্যা বেশি হলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের চেহারা সুন্দর হয়ে উঠে। ব্যক্তির অন্তরটা যদি সুন্দর হয় তাহলে তিনি তার দায়িত্ববোধকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাকে ন্যায্যভাবে ব্যবহার করেন। তিনি সরকারের দুর্বলতা ও সংকটগুলোকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। যদি কোনো ব্যক্তি যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ও মার্জিত হন তাহলে তিনি নিঃসার্থভাবে কাজ করেন এবং ন্যায্যতার সাথেই আইনের সীমাবদ্ধতাগুলোকেও দূর করার চেষ্টা করেন। উল্টোদিকে একজন রক্ষ ও নির্দয় ব্যক্তি সেটা করতে পারেন না।

এরকম সংকট মানুষের ব্যক্তি জীবনেও ঘটতে পারে। একজন মানুষের ব্যক্তিগত চাওয়া বা পছন্দ-অপছন্দগুলো সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিপরীতও হতে পারে। আর সে কারণেই জীবনের কল্যান নিশ্চিতকরনে ব্যক্তির নিজস্ব সংস্কারটাই মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যদি ব্যক্তিগত সংস্কারকে অবহেলা করা হয় তাহলে শুধু ব্যক্তিরই যে লোকসান হবে তা নয় বরং গোটা পৃথিবীর সামনেই ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে। সামনের দিনগুলো দুর্নীতি আর অনাচারে সয়লাব হয়ে যাবে। এ কারণেই পবিত্র আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

‘আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোনো জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা আর স্থগিত করার কোনো সুযোগ নেই এবং সেই জাতিকে রক্ষা করার জন্য তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত আর কোনো সাহায্যকারী নেই।’ (সূরা রাদ: আয়াত ১১)

দুর্নীতিগ্রস্থ এবং অনাচারে ডুবে থাকা প্রাচীন বিভিন্ন জনপদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

‘যেমন, রীতি রয়েছে ফেরাউনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের ব্যাপারে যে, এই জাতিগুলো আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলো এবং সেই পাপের কারণেই আল্লাহ তা’আলা তাদের পাকড়াও করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা। তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনও কোনো জাতির জন্য নির্ধারিত নিয়ামাত কমিয়ে দেন না বা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই তার কর্মফল দিয়ে সেই নিয়ামাত কমিয়ে দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।’ (সূরা আনফাল: আয়াত ৫২-৫৩)

সার্বিক এসব প্রেক্ষাপটের আলোকে ইসলাম সংস্কার ও প্রশিক্ষনের বিষয়টিকে দুইভাবে বিবেচনা করে। প্রথমত: মানুষের ভেতরে একটি স্বাভাবিক মার্জিত ও বিশুদ্ধতা রয়েছে যা তাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ধাবিত করে এবং এভাবে ন্যায়ের পথে থেকে সে খুশীও থাকে। এই বোধগুলো মানুষকে নোংরা, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। ভুলে কোনো অন্যায় করলেও মনে অনুশোচনা বোধের জন্ম দেয়।

মানুষের মধ্যে আবার দ্বিতীয় আরেকটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি মানুষের অভ্যন্তরে কিছু কামভাব আছে, আছে শয়তানের পথ অনুসরণ করার মানসিকতা। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে ভালো কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই বোধগুলো পাপাচারকেই আকর্ষণীয়ভাবে ব্যক্তির সামনে উপস্থাপন করে।

আমরা এখানে এই পাপী মানসিকতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বেশি কথা বলবোনা। এই খারাপ চিন্তাগুলো কি বাইরে থেকে মানুষের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে নাকি এগুলো সহজাতভাবেই মানুষের ভেতরে থাকে সেটা নিয়েও বেশি আলোচনা করবোনা। আমরা বরং এটা বলবো যে, ভালো বা মন্দ উভয়দিকই প্রতিটি মানুষের ভেতরে সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান আছে যা মানুষের জীবনের প্রতিটি ধাপেই ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেলে। মানুষ এক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য বা স্বত্বকে বেশি অগ্রাধিকার দেয় তার জীবনটাও ঠিক সেপথেই অগ্রসর হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।’ (সুরা আশ শামস: আয়াত ৭-১০)

ইসলাম পালনের সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো এটা মানুষের সহজাত ভালো বৈশিষ্ট্যগুলোকে মজবুত করার মত পর্যাপ্ত সুযোগ ও কাঠামো প্রদান করে। ইসলাম অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি নিজেকে আলোকিত করতে পারে, জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। এটা মানুষকে পাপাচার ও দূরাচার থেকে দূরে রাখে। যে সব কাজ মানুষকে সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, ইসলাম সেই সব কাজ থেকে ব্যক্তিকে সুরক্ষা করে এবং তাকে সঠিক পথের উপর অটল রাখে।

প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম:

ইসলামকে প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম বলা যায় যা সব ধরনের ভেজাল থেকে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

‘হে নবি, আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।’ (সুরা আর রুম: আয়াত ৩০)

যেমন চোখের কাজ হলো দেখে যাওয়া, দৃষ্টিপাত করা যতক্ষণ না পর্যন্ত তার দেখার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা হয়। কানের কাজ হলো শ্রবণ করা যতক্ষণ না সেটা বধির হয়। ঠিক একইভাবে, প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো সবসময় সঠিক পথ অনুসরণ করা আর প্রবল বেগে সেই সঠিক গন্তব্যে ধাবিত হওয়া যেভাবে উপর থেকে পানি তীব্র গতিতে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। একমাত্র দুর্নীতি, অনাচার এবং অশীলতার কারণেই সঠিক পথ পানে এই যাত্রা বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশকে সাধারণত অনেক আগে থেকে চলে আসা কিছু আজো বাজে রীতি বা সংস্কৃতি বাঁধাগ্রস্থ করে। এই সব বাজে সংস্কৃতি মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির জন্যও ভালো নয়। অতীতের এসব বাজে কার্যক্রম মানুষের মধ্যেও নানা সমস্যার জন্ম দেয়। যেসব অভ্যাস ও রীতি একজন মানুষের মৌলিক চেতনা ও বিশ্বাসকে দুর্বল করে সেগুলোকে মোকাবেলা করাই হলো একজন প্রকৃত সংস্কারকের কাজ। প্রকৃত সংস্কারক সবসময়ই চেষ্টা করে যাতে প্রকৃতিকে সেসব বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং প্রকৃতির যে স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা- সেটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। ইসলামও এরকম বার্তাই সকলকে দেয়।

সুরা আর রুমের উপরোক্ত আয়াতে সেকারণেই ইসলামকে আল্লাহর ন্যাচার বা প্রকৃতি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। একই সুরার পরের আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন,

‘সবাই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না- যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।’ (সুরা আর রুম: আয়াত ৩১-৩২)

অবিশ্বাসের উপর ইমানকে জয়ী করার জন্য, পাপাচারের পরিবর্তে সততাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং আল্লাহর নিয়ামাতকে অস্বীকার করার পরিবর্তে তাঁর বিধানকে জারি রাখার জন্য, সত্যপন্থী লোকদের মধ্যে চিন্তাগত এবং কৌশলগত একতা থাকাটাও অপরিহার্য কেননা শুধুমাত্র সেভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে এই মানুষগুলো আসলে সত্যের উপর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

‘আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। অতঃপর তাকে নামিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে। শুধুমাত্র তারা ছাড়া যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।’ (সুরা আত তীন: আয়াত ৪-৬)

একজন মানুষের সবচেয়ে উত্তম স্বরূপ তখনই বেরিয়ে আসে যখন সে সত্যকে উপলব্ধি করে, সত্যকে ধারণ করে এবং সত্যের পথে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করে। আর এ জন্য মানুষকে সৎ গুনাবলী লাভন করতে হয়, মার্জিত হতে হয়। এ দুটো বৈশিষ্ট্যই ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ক্ষেত্রে একজন মানুষের সবচেয়ে বড়ো অর্জন হতে পারে। কোনো ব্যক্তি এ দুটো বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারলে জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রে সে তার প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কাংখিত মাত্রায় এই মানবিক গুনাবলীগুলো অর্জন করতে পারেনা। তারা শুধুমাত্র দুনিয়াবী বা পার্থিব খায়েশ পূরণ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করে এবং সেটা করতে গিয়ে নিরন্তরভাবে খোদার আদেশ অমান্য করে। আর এ ধরনের মানুষকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে নীচু থেকে আরও নীচু স্তরে নামিয়ে দেয়ার কথা বলেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

‘আর আল্লাহ কোনো জাতিকে হেদায়েত করার পর ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য হেদায়েত না পাঠান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত।’ (সূরা তাওবাহ: আয়াত ১১৫)

সূরা আল আরাফে আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

‘আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বেখবর রয়ে গেছে।’ (সূরা আল আরাফ: আয়াত ১৪৬)

তাহলে সূরা তীনের সেই মর্মবানী অনুযায়ী কারা থাকবে সেই উত্তম অবয়বে আর কাদেরকেই বা নীচু স্তরে নামিয়ে দেওয়া হবে তা পরিস্কারভাবেই বোঝা যায়। কেননা সেখানে আল্লাহ স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র তারাই রবের পক্ষ থেকে অফুরন্ত পুরস্কার লাভ করবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখবো ইমানের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে হয়। আর এটাও লক্ষ্য করবো যে প্রকৃতপক্ষে সৎ কর্মই হলো নৈতিক চরিত্র লাভের একমাত্র সোপান।

অনাচারের বিরুদ্ধে ইসলাম

এতক্ষণ মানুষের বিশুদ্ধ আচরন নিশ্চিতকরনে এবং অনাচারের বিরুদ্ধে এর শক্ত অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হলো। ইসলাম তার সকল চেতনাগুলোকে সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে ধারণ করার উপর গুরুত্ব দেয়। ইসলাম প্রকৃতির মত করে একেবারে নিঃশর্তভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করার কথা বলে। প্রকৃতির সাথে সাদৃশ্যের ইংগিত পাওয়া যায় রাসূলের (সা.) নানা হাদিসেও।

যেমন মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে আছে, আদম সন্তানেরা একেবারে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে গেলেও দুটো অন্তর্নিহিত স্বভাব ছাড়তে পারেনা। একটি হলো লোভ আর দ্বিতীয়টি অফুরন্ত আশা বা চাহিদা পোষন করা।

আবু দাউদে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে, মানুষের ভেতরে দুটো সহজাত দোষ বিদ্যমান। একটি হলো কাপুরোষোচিতা এবং অসম্মানজনক কৃপনকতা।

বুখারী শরীফের আরেকটি হাদিসে এসেছে, যদি আদম সন্তানকে স্বর্নের তৈরি গোটা একটা উপত্যকাও দিয়ে দেওয়া হয় তারপরও সে এরকমই আরেকটা চাইবে। মাটির ধুলোর সাথে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের চাওয়া, আদম সন্তানের ক্ষুধা কখনোই মিটবেনা। আর যারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে, তারা যদি নিজেদের কৃতকর্ম সমন্ধে অনুতপ্ত হয় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তা কবুল করে নেন।

মানুষের এরকম কিছু সহজাত বৈশিষ্ট্য বা প্রবৃত্তির কথা এসেছে পবিত্র কুরআনে, সুরা আল ইমরানে। আল্লাহ বলেন,

‘মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।’ (সুরা আল ইমরান: আয়াত ১৪)

ইসলাম সবসময়ই বলে যে, মানুষ তার নিজস্ব প্রবৃত্তি ও জাগতিক চাহিদার পেছনে যতই ছুটে বেড়াক না কেন, মানুষ কখনোই তাতে সুখ খুঁজে পাবেনা, সন্তুষ্ট হতে পারবেনা। মানুষের এই উন্মাদনা থেকে সত্য ও ন্যায়ের পথ একেবারেই ভিন্ন। মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি হলো, তার একটি চাহিদা পূরণ হওয়া মাত্রই সে অন্য আরেকটি চাহিদা করতে শুরু করে। মানুষের শরীর সবসময় খাওয়া, পানাহার এবং আরাম আয়েশে থাকতে চায় এবং সবসময়ই ঝামেলামুক্ত একটি জীবন পার করতে চায়। আরামদায়ক জীবন নিশ্চিত করার জন্য সে পাপ করতে কিংবা নিষ্ঠুর হতেও দ্বিধা করেনা। আর সে কারণেই কুরআন মজীদে মানুষকে তার প্রবৃত্তির পেছনে ছুটতে নিষেধ করা হয়েছে।

‘তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা শেষ বিচারের দিনকে ভুলে যায়।’ (সুরা আল সোয়াদ: আয়াত ২৬)

যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনেনা এবং নিজেদের খেয়াল খুশী মতো চলে, তাদের সমন্ধে আল্লাহ বলেন,

‘সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুতেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা সেই উপদেশ অনুধাবন করে না।’ (সুরা আল মুমিনুন: আয়াত ৭১)

নিষিদ্ধ চাহিদা বা প্রবৃত্তি আর বৈধ বা হালালকৃত চাহিদার মধ্যে পার্থক্য করাটা সে কারণেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অনেকেই এই সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো বিষয়কে প্রায়শই গুলিয়ে ফেলেন। যদি মানুষ পৃথিবীতে ভালো থাকতে চায়, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু সেই বিষয়টাকে অর্জন করতে গিয়ে আমরা যখন হারাম কিছুর সাথে আপোষ করতে পরোয়া করিনা, তখনই সেটা অন্যায় হয়ে যায়। ফলে হালাল পথে থাকতে চায় এরকম মানুষের বিবেকও আস্তে আস্তে ভোঁতা হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে সে তখন অন্যায়টাকে আর অন্যায় মনে করেনা বরং দুনিয়াতে ভালো থাকার একটি উপায় হিসেবে সেই অন্যায়গুলোকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করে।

যখন একজন মানুষ অনুভব করে যে সে একটা ভুল করে ফেলেছে আর সেই ভুলটা এখন তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, তখন সে আরও গুরুতর অপরাধ করতে পরোয়া করেনা।

তখন সেই পাপগুলোই তার জীবনের মূল চেতনায় পরিনত হয়। পবিত্র কুরআন এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্পষ্টভাবেই ব্যক্তির বিশুদ্ধ চাহিদাকে সম্পূর্ণরূপেই বৈধ ঘোষণা করেছে এবং শুধু তাই নয়, হালাল উপায়ে সেই চাহিদা পূরনেরও সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু একই সংগে কুরআন এই প্রক্রিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো কৌশলের ব্যপারেও সতর্ক করে দিয়েছে কেননা এইসব সাংঘর্ষিক ও বিপজ্জনক কৌশলগুলোই পরবর্তীতে অশ্লীলতা ও পাপের দরজা খুলে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘হে মানব মন্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান না।’ (সূরা আল বাকারাহ: আয়াত ১৬৮-১৬৯)

একথা বলতেই হবে যে, ইসলাম যা হালাল করেছে, যে কোনো কৌশলেই তার উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার মানে হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। আর শয়তান এটাই চায় যাতে হালাল বিষয় ও হালাল কর্মপন্থার বিষয়ে আমাদের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। তবে ইসলাম কোনো বিষয়ই জোর করে বা শাস্তিমূলক উপায়ে চাপিয়ে দিতে চায় না। আবার কোনো কিছুকে বাড়তি অতিরঞ্জিত করে তাকে বশে আনার চেষ্টাও ইসলাম করেনা। ইসলাম সবসময়ই একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অনুসরণ করে। ইসলামে অতিরঞ্জিত বা অতিরিক্ত কিছু করার সুযোগ নেই।

নৈতিকতাই টিকে থাকে

মানুষের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সুন্দর ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ তা আল্লাহর দেওয়া বিধানের মধ্যে থাকে। এই সৌন্দর্যের সাথে ধর্মহীনতা ও অজ্ঞতার কোনো সম্পর্ক নেই। আর যখন তা আল্লাহর দেওয়া বিধানের বিরুদ্ধে যায়, তাতে নানা সংকট দেখা দেয়। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য করতে পারে কেবলমাত্র উত্তম চরিত্র। পবিত্র কুরআনে যেমন মানুষের দোষ ত্রুটি, দুর্বলতা, অসদাচার, উদ্বিগ্নতা নিয়ে কথা বলা হয়েছে তেমনি আবার এটাও বলা হয়েছে যে, এসব মানবিক দুর্বলতা থেকে মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর দেওয়া দ্বীনকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

‘মানুষ তো সৃষ্টি হয়েছে ভীতুরূপে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন সে কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা ছাড়া, যারা নামায আদায়কারী। যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে অভাবী ও মিসকিনদের এবং যারা শেষ বিচারের দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তির আশংকা থেকে মুক্ত থাকা যায়না। এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে।’ (সূরা আল মা’ আরিজ: আয়াত ১৯-২৯)

এটা সবাই জানে যে রাতারাতি কেউ উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে যেতে পারেনা। কিংবা শুরু থেকেই কারও চরিত্র খুব মজবুত বা দৃঢ় নাও হতে পারে। চরিত্রকে উত্তম করার জন্য ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়, নিয়মিত প্রচেষ্টা চালাতে হয় আবার নানা পর্যায় ও ধাপ অতিক্রম করে চরিত্রকে আরও সমুন্নত ও সুন্দর করার চেষ্টা করতে হয়। আর এ কারণেই যেসব কাজে চরিত্র উন্নত হয় সেসব কাজ নিয়মিত অনুশীলন করাটাও জরুরী। বিশেষ করে সালাত, রোজা, হজ্জ, জাকাত এবং অন্যান্য ইবাদাতগুলো নিয়মিতভাবে পালন করে যেতে হয়। আখেরাতের উপর ঈমানকে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করতে হয়। সবসময় শেষ বিচারের দিনের শাস্তি সম্পর্কে ভয় করতে হয়। যখন মন আল্লাহর দেওয়া বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়াস নেয় এবং প্ররোচনার মধ্য দিয়ে মনকে বিপথে চালাতে চায়, তখন তা থেকে নিজেকে বাঁচানোর সহজ কোনো রাস্তা নেই। সেই কেবল নিজেকে অন্যায় এসব প্ররোচনার হাত থেকে মুক্ত রাখতে পারে যার ঈমান ও অনুশীলন শয়তানের সেই সব কুটকৌশলের চেয়েও শক্তিশালী। ঈমান ও ধর্মীয় অনুশীলন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আবারও ভারসাম্যমূলক একটি জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

উপরোক্ত আলোচনার সার কথা হলো, মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও আচরনকে ইসলাম বিবেচনায় নেয়। কিন্তু একই সংগে ইসলাম মানুষের সহজাত এসব প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রন করার ব্যপারে মানুষকে বার বার সতর্কও করেছে। ইসলাম ব্যক্তির নিয়মিত সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানুষের অন্তর্নিহিত বিদ্রোহী আত্মাকে বশে রাখার জন্যই ইসলাম বেশ কিছু ইবাদাতকে বাধ্যতামূলক করেছে যেগুলো মানুষকে শয়তানের পথ থেকে ফিরিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসবে। আর এসব ইবাদাত কখনোই সঠিকভাবে আমল করা সম্ভব নয় কিংবা ইবাদতের মূল লক্ষ্য কখনোই অর্জন করা সম্ভব নয় যদি না ইবাদাতকারী ব্যক্তি উত্তম চরিত্রের অধিকারী না হয়।